Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume – 2, Issue-II, published on April 2022, Page No. 215 – 220
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
ISSN : 2583 – 0848 (Online), Impact Factor : 2. 857

নগরজীবনের রাজনীতির ভিন্ন স্বর : প্রসঙ্গ সত্তর ও আশি দশকের নির্বাচিত বাংলা উপন্যাস

জয়দেব ব্যানার্জী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ
Mail ID : joydevbanerjee15@gmail.com

Keyword
বাংলা উপন্যাস, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনন্দমঠ, বন্দেমাতরম, গোরা, ঘরে বাইরে, পথের দাবী, প্রতিবিম্ব, সতীনাথ ভাদুড়ী, জাগরী, গোপাল হালদার, অন্যদিন, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, মানবজমিন, নগর রাজনীতির প্রভাব।

Abstract

Discussion

সভ্যতার ইতিহাসে রাজনীতি ও মানুষ একে অপরের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। মানুষের প্রয়োজনকে সামনে রেখেই রাজনীতির জন্ম হয়। আদিম অসভ্য পর্ব থেকে মানুষ যেদিন দলবদ্ধ গোষ্ঠীরূপে বসবাসের জন্য নীড় রচনা করল, সেদিন থেকেই মানুষের জীবনে যুক্ত হয়ে গেল রাজনীতি। প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস বিশ্লেষণে আমরা রাজনীতি ও মানবজীবনের পারস্পারিক সংযুক্ত বোধের ধারণা লাভ করি। বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিস্বার্থ রাজনীতির ভিত্তিমূলের সংরূপ রচনা করেছিল। মানুষের জীবনযাত্রার ব্যাপক পরিবর্তনে যে সভ্যতার বিকাশসাধন যুক্ত ছিল, সেখানেও মানুষ রাজনীতির চর্চাকে অব্যাহত রেখেছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শ্রমের বিভাজনে সমাজ আরো জটিল হয়ে পড়লে গোষ্ঠীজীবনের নেতৃত্বরা নির্দিষ্ট নিয়মকানুনের ভিত্তিতে প্রশাসন তৈরি করেছিল। এই প্রশাসন রাজনৈতিক ভাবনায় মানুষের উপর শাসনব্যবস্থার ঘেরাটোপ রচনা করেছিল। নদীভিত্তিক অঞ্চলে সভ্যতার প্রসার লাভ ঘটলে কৃষিপ্রযুক্তি, বাণিজ্যসহ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও শাসনব্যবস্থারও পরিবর্তন সূচিত হয়। স্থানীয় অঞ্চলে তো বটেই, সার্বিকভাবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ছত্রছায়াতে মানুষের রাজনৈতিক নির্ভরতা বেড়ে যায়। মানবজীবনের উপর প্রযুক্ত এই রাজনীতি মানুষের ব্যক্তিগত পরিসরে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। সাহিত্যে উঠে আসে তার পরিচয়।

সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্কের গভীরতা অস্বীকার করা যায় না। সামাজিক জীবনে বসবাস করে, রাষ্ট্রের অধীনে জীবন পরিচালনা করে সাহিত্যিকরা রাজনৈতিক বাস্তবতাকে এড়িয়ে যেতে পারেন না। রাজনীতি মানুষের

জীবনে যেভাবে প্রভাব ফেলে, সেই অভিজ্ঞতা একজন রচনাকারের সাহিত্য রচনার উপাদান হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিফলন, দৈনন্দিন জীবনে তার প্রভাব প্রভৃতি বিষয় একজন রচনাকার তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরতে পারেন। রাজনীতি সচেতন সাহিত্যিক তাঁর রচনায় ক্ষমতা ও রাজনীতিকে সাহিত্যের নথিতে গ্রন্থিত করার উৎসাহ পেতে পারেন। রাজনৈতিক পরিবেশে মানুষের অভিজ্ঞতা, সামাজিকতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক এই সূত্রেই বিভিন্ন লেখাতে উঠে আসে। সমাজের পালাবদলের সঙ্গে রাজনৈতিক ঝড়-ঝঞ্ঝা যুক্ত থাকতে পারে। একজন লেখক নির্মোহ ভঙ্গীতে সেই পালাবদলের ছবি সাহিত্যের আঙ্গিনায় তুলে ধরতে পারেন। এককথায় বলতে গেলে রাজনীতি সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়ে পড়লে রাজনৈতিক বাস্তবতা তুলে ধরার অবকাশ তৈরি হয়। অন্যায়, বৈষম্য, শোষণ, অধিকার, স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ে সামাজিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত রাজনৈতিক ভাবনা বহুকাল ধরে বাংলা সাহিত্যের পাঠকবর্গকে আমোদিত করেছে।

বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস বিভাগে রাজনীতির চর্চা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঔপনিবেশিক যুগ থেকে জাতীয়তাবাদ, রাষ্ট্র ও ক্ষমতার রাজনীতি, স্বাধীনতা, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি বিষয় বাংলা উপন্যাসে জায়গা করে নিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে (১৮৩৮-১৮৯৪) এক্ষেত্রে পথিকৃৎ বলা চলে। দেশ ও জাতীর সার্বিক পরিচয় তাঁর শিক্ষিত নাগরিক চেতনায় সুপ্ত ছিল। সেই চেতনারই বহিঃপ্রকাশ 'আনন্দমঠ' (১৮৮২)-এর মতো উপন্যাস। যে উপন্যাসে 'বন্দেমাতরম' গানটি শুধু সত্যানন্দের মতো বিদ্রোহী মানুষকেই নয়, সারা ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী চেতনার স্মারক হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) জাতীয়তাবাদী চিন্তা স্বদেশপ্রেমের আধারে প্রসার লাভ করেছে। 'গোরা' (১৯১০), 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) প্রভৃতি উপন্যাসে তৎকালীন কলকাতার নগর রাজনীতির প্রভাব ভীষণ স্পষ্ট।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষ রাজনৈতিক মনোভাবনায় যুক্ত হয়ে পড়ে। বাংলা উপন্যাসে নগরজীবনে এই রাজনীতির উত্তাপ তুলে ধরতে ঔপন্যাসিকরা সচেষ্ট হয়ে পড়েন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী' (১৯২৬) উপন্যাসটিকে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। বিংশ শতাব্দীর তিরিশ, চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের কথাকাররা যুগ ও জীবনের অস্থির আবহে নগর রাজনীতির আর বাস্তব বয়ান তৈরি করলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রতিবিম্ব' (১৯৪৩), 'চিহ্ন' (১৯৪৭), 'স্বাধীনতার স্বাদ' (১৯৫১) প্রভৃতি উপন্যাসে রাজনৈতিক আবর্তে আটকে পড়া মেহনতি মধ্যবিত্ত নাগরিকদের জীবনযন্ত্রণা লিপিবদ্ধ রয়েছে। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' (১৯৪৫), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মন্ত্রমুখর' (১৯৪৫), বনফুলের অগ্নি (১৯৪৬), গোপাল হালদারের 'অন্যদিন' (১৯৫০) প্রভৃতি রচনা এই প্রসঙ্গেই আলোচিত হয়ে পড়ে।

স্বাধীনতা উত্তর পরিস্থিতিতে নগর রাজনীতির অস্থির আবহ মানুষের অস্তিত্বের শেকড়ে টান তৈরি করে। দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা নগরের আলোকিত ভূমিকে সমস্যাবহুল করে তোলে। অন্যদিকে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতায় মানুষের বেঁচে থাকাটাই প্রশ্নের মুখে পড়ে যায়। খাদ্যসংকট (১৯৫৯), চিন-ভারত সংঘর্ষ (১৯৬২), পাকিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধ (১৯৬৫), খাদ্যাভাব (১৯৬৬) প্রভৃতি অভিঘাতে নগরজীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক দোলাচলতার এই সময়পর্বে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে সংযোজিত হয় নতুন আন্দোলন, নকশালবাড়ি আন্দোলন (১৯৬৭)। এই আন্দোলন প্রথমে উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত এলাকাতে শুরু হলেও অল্পকালের মধ্যে নগরভূমিকেও প্লাবিত করে।

বিংশ শতাব্দীর ষাট-সত্তর দশকের কালপর্ব পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক চালচিত্র বাঙালি জাতিসত্তার আত্মানুসন্ধানের চিত্র। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মানুষের জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত হয় যে রাজনীতির দ্বারা, সেই রাজনীতির প্রতিফলন এই সময়পর্বের সাহিত্যরচনাতে উঠে এসেছিল। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে রাজনৈতিক অভিঘাত মানবজীবনের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। সত্তর দশকে একদিকে যেমন নকশালবাড়ি আন্দোলন ভয়াল রূপ পরিগ্রহ করেছিল, তেমনি ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধ (১৯৬৫), বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১)-র প্রভাব নগরজীবনের বাঙালিকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। যুগ ও জীবনের এই আবহে বাংলা সাহিত্যের ঔপন্যাসিকরা নাগরিক ভূমিতে সৃজিত রাজনৈতিক ঘটনাগুলিকে উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করেছেন। সত্তর-আশি দশকে রচিত নির্বাচিত কিছু উপন্যাসের নিবিড় পাঠে বিষয়টি ধরা পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গের সত্তর দশকের রাজনৈতিক আবহাওয়ার জমাট মেঘ তপোবিজয় ঘোষের লেখা 'সামনে লড়াই' (১৯৭১) উপন্যাসটিতে পরিলক্ষিত হয়। চারটি চরিত্রের জবানীতে রচিত এই উপন্যাসে চব্বিশ পরগণা জেলার মহকুমা

শহরে সংঘটিত রাজনৈতিক ঘটনার পরিচয় রয়েছে। বাংলার রাজনীতির ইতিহাসে তখন বিশেষ সন্ধিক্ষণ। যুক্তফ্রন্ট সরকারের দ্বিতীয় মন্ত্রীসভা ভাঙনের মুখেই মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় ইস্তফা দিয়ে দেন। বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন শুরু হয়। ঠিক সেইসময়ই রাজনৈতিক কর্মী তমালের মৃত্যু শহরে আলোড়ন ফেলে দেয়। তমালেই এই উপন্যাসের নায়ক। জগৎবল্লভের কাছে মানুষ হওয়া এই তরুণ নগর রাজনীতির পাঠে দীক্ষিত। বামপন্থী মতাদর্শকে সামনে রেখেই সে নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রনেতা রূপে নিজেকে মেলে ধরে। শোষিতদের অধিকার নিয়ে লড়াইয়ের জন্য সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে। তরুণ তুর্কী এই তমালের কার্যকলাপ মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাড়ায় মণিশঙ্কর, জয়শঙ্করদের। পূর্ববর্তী সরকারের মন্ত্রী মণিশঙ্কর এই নগরের সবচেয়ে বড় রাজনীতিবিদ। ক্ষমতা ও দর্পের ইতিহাস তার রক্তের সঙ্গে বাঁধা। পিতার জমিদারী একপ্রকার জলের দরে বিক্রি করে এই শহরে এসেছিল একসময়। গ্লাস ফ্যাক্টরি, বাস সার্ভিস চালু করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিল। সে বুঝেছিল, রাজনৈতিক ক্ষমতা না পেলে ব্যক্তির জীবন ইতিহাসে জায়গা পায় না। ক্ষমতা ও অর্থবলে সে রাজনৈতিক মন্ত্রিত্ব লাভ করেছিল। নিজের ছেলে জয়শঙ্করকেও তিনি সেই মন্ত্রে দীক্ষা দেন। জীবনের সুষম মূল্যবোধ নিয়ে চললে নগর রাজনীতির ক্ষমতার অলিন্দে পৌঁছানো সম্ভব নয়। যে যত বেশি স্বার্থপর, যে যত বেশি আখের গোছাতে পারে, রাজনৈতিক জীবনে সে তত বেশি সফল। সমকালীন নগরজীবনে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ছবিটিও এই প্রসঙ্গে জয়শঙ্কর তুলে ধরেছে : -

> "খোঁজ নিয়ে দেখুন, নেতারা সব তলে তলে আখের গোছাচ্ছে। যা-হোক একটা গোলমাল পাকিয়ে, হরতাল-ধর্মঘট ডেকে, স্কুল-কলেজ বন্ধ করে, কচি-কাচা ছেলেগুলোকে পুলিশের গুলির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আর নেতারা দিব্যি গাড়ী হাঁকিয়ে সাহেবী হোটেলে খানাপিনা, পার্কস্ট্রিটে ঢুকু ঢুকু চালিয়ে যাচ্ছে! দেশের একমাত্র মুখ্য মানুষকে শহীদ বানিয়ে মালা পরিয়ে লীডাররা মন্ত্রী-উপমন্ত্রী হয়ে দিব্যি গোঁফে তা দিয়ে ছড়ি ঘোরাচ্ছে। বিড়লা বাড়ীর পর্দার আড়ালে বসে গুজুগুজু ফুসফাস করে শ্রমিকের বেতন কেটে বউয়ের নামে বালিগঞ্জে জমি কিনছে!"[১]

রাজনৈতিক নেতাদের এই আপসকামী রাজনীতি নগরের সমাজজীবনে দারুণ প্রভাব ফেলেছিল। ছাত্র-যুবরা প্রভাবিত হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। বামপন্থী মতাদর্শের চেতনায় দীক্ষিত এই ছাত্র-যুবরা নগরজীবনে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। তমাল তাদেরই প্রতিনিধি। ভাই অশোকের মতো সে রাজনীতির উগ্রপন্থায় বিশ্বাসী নয়। নাগরিক জনসাধারণকে শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস সে তৈরি করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সে কল্যাণকামী রাজনীতির পাঠ দেয়। তার এই রাজনৈতিক সক্রিয়তা ক্ষমতাবান শোষকদের অস্থির করে তোলে। সমালোচক জানিয়েছেন : -

> "বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলাকার সংগঠন সর্বত্রই তমালের ব্যক্তিত্ব তার রাজনীতিকে উজ্জ্বলতা দেয়, কারণ ব্যক্তি তমালের রাজনীতিই তার ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে। সেই তমাল খুন হয় জয়শঙ্করের হাতে। কারণ তমালদের উত্থানটি হয়ে উঠেছিল এই খুনী, শোষক-ঘাতক জয়শঙ্করদের অধিকারের বিরুদ্ধে উদ্ধত প্রশ্ন।"[২]

তমালের রাজনীতির এই দিকটি অলকেশ, নন্দিতা, শিখাদের প্রভাবিত করেছে। পুলিশের অতি সক্রিয়তাতেও তারা ভয় পায়নি। উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত তমালের মৃত্যুতে নগরজীবনের জাগরণের কথা জায়গা করে নিয়েছে। উপন্যাসটিতে অত্যন্ত বিস্তৃত আকারে নগরজীবনের উপর সমকালীন রাজনীতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। রাষ্ট্রীয় নির্যাতন, গণসংগ্রাম, কমিউনিস্ট আন্দোলন, কংগ্রেসি রাজনীতি প্রভৃতি বিষয় এই উপন্যাসে সমকালের প্রেক্ষিতে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। সমালোচক জানিয়েছেন : -

> "সত্তর দশকের সন্ত্রাস, হিংস্র অমানবিক বর্বরতা এবং ষাটের দশকের সংগ্রাম ও আশাভঙ্গের ইতিহাস যারা সাহিত্যের দর্পণে অনুভব করতে চান, তাদের 'সামনে লড়াই' না পড়ে সেই সাধ পূরণের কোন বিকল্প নেই।"[৩]

আসলে স্বাধীনতা উত্তর পরিসরে রাজনৈতিক চেতনা সমকালীন কথাকারদের রচনার উপাদান শুধু হয়ে ওঠেনি, তাদের নান্দনিক চিন্তার উপকরণ হয়ে উঠেছিল। সময় ও সমাজের ঘটনাবহুল ক্যানভাসে বাংলা ঔপন্যাসিকরা নগর রাজনীতির

বিশেষ বিশেষ ঢেউকে আপন করে নিয়েছিলেন। দেশভাগের পরে কৃষক আন্দোলনের সূত্র ধরে ভারতবর্ষে নকশাল আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে শুরু হওয়া এই আন্দোলন নগরজীবনেও ব্যাপক প্রভাব ফেলে। নকশালবাদী আন্দোলনের অভিমুখটি যাই থাকুক না কেন, নগরজীবন এর ফলে বেশ আন্দোলিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে একজন সমালোচক নকশালবাদ বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে যা বলেছেন, তা তুলে ধরা প্রয়োজন : -

> "রাজনৈতিক মহলে নকশালবাদ কথাটি চালু থাকলেও, ঘটনা হল, নকশালবাদ নামে সুনির্দিষ্ট কোন মতবাদ নেই। নকশালবাড়ির যে কৃষক আন্দোলনকে চিনের কমিউনিস্ট পার্টি একদা 'ভারতের বুকে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ' হিসেবে চিহ্নিত করে, সেই নকশালবাড়ির কৃষক অভ্যুত্থান থেকে পরবর্তীকালে যে বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক ধারা উদ্ধৃত হয়, সেগুলিকে একটি মোড়কে উপস্থাপনার জন্য নকশালবাদ কথাটির আমদানি। এই শব্দবন্ধ দিয়ে নকশালবাড়ি থেকে উদ্ধৃত পরবর্তীকালের নকশাল আন্দোলনকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।"[৪]

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে নকশালবাড়ি আন্দোলন সময়ের সঙ্গে বাঁকবদল করলেও উপন্যাস সাহিত্যে এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। স্বর্ণ মিত্রের 'গ্রামে চলো' (১৯৭২), সমরেশ বসুর 'মহাকালের রথের ঘোড়া' (১৯৭৭), গুণময় মান্নার 'শালবনী' (১৯৭৮) প্রভৃতি উপন্যাস এই প্রসঙ্গেই আলোচনায় উঠে আসে। সত্তর দশকের এই সময়ে নকশাল আন্দোলন কেন্দ্রিক অপর একটি বিখ্যাত উপন্যাস মহাশ্বেতা দেবীর লেখা 'হাজার চুরাশির মা' (১৯৭৪)।

উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র সুজাতার প্রিয় সন্তান ব্রতী। উত্তাল দশকে নগরজীবনে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত সে। শোষকশ্রেণির অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে সে প্রতিবাদের আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এক রাতে দুষ্কৃতিদের নির্মমতায় তাকে খুন হয়ে যেতে হয়। ব্রতীর মৃত্যুর পর সুজাতার চারবেলার স্মৃতিচারণ এই উপন্যাসের আখ্যান রচনা করেছে। যেখানে নগরজীবনে অভিজাত পরিবারের অন্তসারশূন্য বন্ধনের পাশাপাশি নকশাল আন্দোলন, বস্তিবাসী মানুষের যাপনচিত্র জায়গা করে নিয়েছে। শুধু একা ব্রতী নয়, সমু, পার্থরাও এই আন্দোলনের শরিক হিসাবে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। নগরজীবনের প্রেক্ষাপটে তরুণ প্রজন্ম রাজনৈতিক দিশাহীন নীতির ফলে অকালে ঝরে পড়েছে। উপন্যাসের এক জায়গায় সুজাতার মনে হয়েছে : -

> "ব্রতীর বয়স কম ছিল। একটা বিশ্বাস ওকে, ওদের অন্ধ করে দিয়েছিল। ওরা বোঝেনি, যে-ব্যবস্থার সঙ্গে ওদের যুদ্ধ, সে-ব্যবস্থা জন্মের আগে বহুভ্রূণকে বিষাক্ত করে দেয়। সব তরুণ আদর্শ দীক্ষিত নয়, সবাই মৃত্যুকে ভয় করে না, এমন নয়, এ কথা ব্রতীরা জানত না।"[৫]

বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকের ইতিহাসে নকশালদের নগর সন্ত্রাসের ছবি খুঁজে পাওয়া যায়। পুলিশের রাইফেল ছিনতাই থেকে হত্যা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আগুন ধরিয়ে দেওয়া, গুপ্ত হত্যা ইত্যাদি নগর রাজনীতিকে আন্দোলিত করেছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১), ভারতবর্ষে উদ্বাস্তু আগমনে নগর রাজনীতি ভিন্ন পথে পরিচালিত হলে নকশালরা ব্রাত্য হয়ে পড়ে। তাদের আন্দোলনে ভাঙন ধরে। এই পরিস্থিতিতে ব্যাপক পুলিশি সন্ত্রাস আছড়ে পড়ে তরুণদের উপর। ব্রতীর মৃত্যু তেমনি একটি উদাহরণ।

নগরজীবনে রাজনৈতিক চেতনা অবশ্য পরবর্তী আশির দশকে অনেকটাই পাল্টে যায়। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পরে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতি তার তেজ হারিয়ে ফেলে। নবনির্বাচিত বামফ্রন্ট সরকার কৃষকদের উন্নতি কল্পে বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করে, পার্টি সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করে। কিন্তু নগরজীবনে রাজনীতির আকাশে দলীয় হিংসা, বামপন্থী চেতনার নবরূপায়ণ, বেকারত্ব, শিল্পে সংকট প্রভৃতি বিষয় তরুণ প্রজন্মকে ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত করে। সমরেশ মজুমদারের লেখা 'কালবেলা' (১৯৮৩) উপন্যাসটি এই প্রসঙ্গেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

আলোচ্য উপন্যাসটিতে জলপাইগুড়ি শহরের ছেলে অনিমেষ কলকাতায় এসে পায়ে গুলি খায়। পড়াশুনোর সূত্র ধরে ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। বামপন্থী মতবাদের সমর্থক এই অনিমেষ দেশের জন্য কিছু করার উদ্দেশ্যেই রাজনৈতিক প্রচারকাজে নেমে পড়ে। তার মনে হয় : -

> "দেশের জন্য কেউ যদি কিছু করতে চায় তা হলে তাকে একটা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হলেই হবে। পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেসের বিকল্প দল এখন একটাই। যদিও ঘোলাজলের মতো একই জায়গায় পাক খাচ্ছে তবু যা কিছু নাড়াচাড়া এই দলেই। বামপন্থী কমিউনিস্ট দলের কাজকর্ম, মতবাদ এবং নেতৃত্ব সম্পর্কে কোনওরকম আশা করার কিছু না থাকলেও খুব সামান্য কাজ এই দলে থাকলেই করা যাবে।"[৬]

দলের মতাদর্শকে সামনে রেখেই অনিমেষ প্রথমে নগর রাজনীতির আবর্তে ও পরে নির্বাচনী প্রচারকাজে নিজেকে মেলে ধরেছে। স্বার্থের রাজনীতি সে করতে চায় না। ছোটকাকার মতো ক্ষমতার রাজনীতিতেও সে বিশ্বাসী নয়। শোষকশ্রেণির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলায় তার একমাত্র উদ্দেশ্য। এই রাজনীতিতে অনিমেষ কিছু পায়নি, শুধু হারিয়েছে। তার ব্যক্তিগত জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্ত্রী মাধবীলতাকে পুলিশের লকআপে অত্যাচারিত হতে হয়েছে। উপন্যাসের শেষে তাই সমকালীন রাজনীতিতে পিষ্ট অনিমেষের বুকে নেমে আসে অবসাদ : -

> "অবসাদ আর অবসাদ। নিজের শরীরের দিকে তাকালে অবসাদে আচ্ছন্ন হতে হয়। নিজের দেশের দিকে তাকালেও একই অবস্থা। অনিমেষের মাঝে মাঝে তাই মনে হছে তার সঙ্গে ভারতবর্ষের কোন পার্থক্য নেই। এভাবে লেংচে লেংচে পাছা ঘষটানি দিয়ে চলছে দেশটা। তাকে দাড় করানোর কোনও ওষুধ কারও জানা নেই।"[৭]

সময়ের অভিঘাতে বদলে যাওয়া ব্যক্তিজীবনের কথন এইভাবেই উপন্যাসের পৃষ্ঠায় ধরা পড়ে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'মানবজমিন' (১৯৮৮) উপন্যাসে সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষিতে রচিত হলেও এতে নগরজীবনের রাজনীতির পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়। উপন্যাসের মণিদীপা চরিত্রটি বামপন্থী মতাদর্শে দীক্ষিত। পারিবারিক রাজনৈতিক বোধ তার ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক হয়ে উঠেছে। মিস্টার বোসের স্ত্রী হলেও সে বোসের অধিকার ভাবনা, পুরুষতান্ত্রিক একাধিপত্য মেনে নেয় না। সে বলে : -

> "মানুষ হিসেবে ওর প্রতি আমার ভালোবাসা এবং সহানুভূতি আছে। তবে আমরা শ্রেণীশত্রুর প্রতি কিছুটা নির্দয়।"[৮]

সমাজবিপ্লবের আবেগ প্রবাহ আখ্যানের পরিসরে সত্তর আশি দশকের নগর রাজনীতিকে সঙ্গে নিয়েই বর্ধিত হয়েছে। চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের প্রগতিশীল রাজনীতির বোধ এই সময়ের সাহিত্য রচনাতে দেখা যায় না। নগরজীবনের বদলের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির চর্চাও ভিন্ন পথে অগ্রসর হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ঔপন্যাসিকরা সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন। স্বাধীনতা উত্তর বাংলা সাহিত্যে নগরজীবনের রাজনীতি বাংলা উপন্যাসে সার্থক ও সুন্দর ভাবে ধরা পড়েছে।

Reference:

১. ঘোষ, তপোবিজয়, সামনে লড়াই, নবজাতক প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৭, প্রকাশক : মজাহারুল ইসলাম এ-৬৪, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা – ৭০০০১২, পৃ. ৩২

২. দাস, অরূপকুমার, ষাট ও সত্তর দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্য, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১২, প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, ১৮এ টেমার লেন, কলকাতা – ৯, পৃ. ৪৯

৩. লাহিড়ী, সৌমিত্র, সামনে লড়াই দ্বিতীয় পাঠের অভিজ্ঞতা, কোরক (শারদীয় সংখ্যা), সম্পাদনা : তাপস ভৌমিক, দেশবন্ধুনগর, ইএ ১/৮ বাগুইহাটি, কলকাতা-৫৯, পৃ. ২৯৩

৪. চট্টোপাধ্যায়, অসীম, নকশালবাদ থেকে 'মাওবাদ' – উত্তরণ না অপবিকৃতি, এই সময়ের দলিল ও অন্যান্য, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ. ১২১

৫. দেবী, মহাশ্বেতা, হাজার চুরাশির মা, করুণা প্রকাশনী, চতুঃবিংশ মুদ্রণ: এপ্রিল ২০২২, প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা – ০৯, পৃ. ৩৭

৬. মজুমদার, সমরেশ, কালবেলা, সপ্তম মুদ্রণ: জুন, ২০২২, প্রকাশক: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, হেডঅফিস: ৯৫ শরৎ বোস রোড, কলকাতা – ২৬, পৃ. ৩২৯
৭. প্রাগুক্ত, কালবেলা, পৃ. ৫৯৩
৮. মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু, মানবজমিন, উনবিংশ মুদ্রণ: মার্চ, ২০২২, প্রকাশক: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, হেডঅফিস : ৯৫ শরৎ বোস রোড, কলকাতা – ২৬, পৃ. ১৯৪

Bibliography:

আচার্য, অনিল (সম্পাদিত), সত্তর দশক (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড), তৃতীয় সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১২, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা – ০৯
আচার্য, অনিল (সম্পাদিত), তিন দশকের গণ আন্দোলন, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল, ২০১৮, প্রকাশক: আশিস ঘোষ, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা – ০৯
ঘোষ, নির্মল, নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১লা মাঘ ১৪০১, করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা - ০৯
চৌধুরী, নাজমা জাসমিন, বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ: ডিসেম্বর ২০০৯, প্রকাশক: শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা – ৭৩
ভট্টাচার্য, তপোধীর, উপন্যাসে সময়, এবং মুশায়েরা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৯, ১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা - ৭৩
সুর, নিখিল, কলকাতার নগরায়ণ : রূপান্তরের রূপরেখা, পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০১৫, সেতু প্রকাশন, প্রকাশক : অর্চনা দাস ও সুব্রত দাস, ১২/এ, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলকাতা – ০৬